সংশয়ঃ রাসুল (সা) বলেছেন, “যুদ্ধ কামনা করো না।”

গুটিকয়েক নরমপন্থী ও সরকারি সালাফিদের দ্বারা উদ্ধৃত আরেকটি সংশয়ের জবাব শায়খ আব্দুল কাদির বিন আব্দুল আজিজ (হা)'র লেখা কিতাব মা'আলিমু আসাসিয়াহ'র একটি অধ্যায় থেকে চয়িত।
অনুবাদ করেছেন- মুফতি ইবনে মাহবুব (দা বা)
কেউ কেউ আক্রমণাত্মক জিহাদ অস্বীকার করার পক্ষে এ আয়াত দিয়ে দলীল দেয়-

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

"আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তোমরাও সেই দিকে ঝুঁকে পড়বে"। (আনফাল:৬১)

তারা বলে থাকে, যতক্ষণ কাফেররা সন্ধিতে সম্মত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করা জায়েয হবে না। তারা রাসূল সা. এর এই হাদীসটি দিয়েও দলিল দিয়ে থাকে,

لا تتمنوا لقاء العدو

"তোমরা শত্রুর সাক্ষাত কামনা করো না"। (বুখারী, মুসলিম)
এটা আসলে যারা আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশের প্রতি ঈমান রাখে আর কিছু অংশের ব্যাপারে কুফরীতে লিপ্ত, তাদের অবস্থা। তারা একটি মাস'আলার অনেকগুলো দলীলের মধ্যে থেকে একটি দলীল গ্রহন করে, আর বাকীগুলোকে এড়িয়ে যায়।
এ সংশয়ের নিরসন কয়েকভাবে করা যায়:
১। রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরাম, যারা এ উম্মতের শ্রেষ্ঠাংশ, তারা কুরাআন ও সুন্নাহর এই উদ্বৃতিগুলোকে এরা যেভাবে বুঝেছে সেভাবে প্রয়োগ করেননি, যার মর্ম দাড়ায় আক্রমণাত্মক জিহাদকে বর্জন করা। কেননা রাসূল সা. আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাবুকে রুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। উনিষটি যুদ্ধ রাসূল সা. পরিচালনা করেছেন, যার আটটিতে স্বয়ং তিনি যুদ্ধ করেছেন।

আর যে সকল বাহিনী তিনি প্রেরণ করেছেন, স্বশরীরে সাথে বের হননি, তার সংখ্যা ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে ৩৬ টিতে গিয়ে দাড়িয়েছে। অনেকে আরও বেশিও বলেন। (ফাতহুল বারী: ৭/২৭৯-২৮১, সহীহুল মুসলিম বিশরহিল ইমামিন নববী:১২/১৯৫)

অতঃপর রাসূল সা: ’র পরে সাহাবায়ে কেরাম পারস্য, রোম, কিবতী, বার্বার ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন, যা সকলের জানা আছে।

তাই যারা আক্রমণাত্মক জিহাদকে বাতিল করার জন্য এই উদ্বৃতিগুলো দিয়ে দলীল দেয়, আমরা তাদেরকে বলবো: তোমরা এমন জিনিস বুঝেছ, যা সাহাবায়ে কেরাম বুঝেননি। তোমরা নিজেদের ব্যাপারে গোমরাহী বেছে নিয়েছ। তোমরা যা বুঝেছ সেটা আমাদের দ্বীন নয়।

কারণ দ্বীন তো রাসূল সা. এর জীবদ্দশায়ই পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম”।

তোমাদের এই বুঝ প্রত্যাখ্যাত-

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد “যে এমন আমল করে যা আমার আদর্শের পরিপন্থী তা প্রত্যাখ্যাত”।

তুমি তোমার এই ভ্রষ্ট বুঝের কারণে রাসূল সা. ও সাহবায়ে কেরামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“আর যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করবে, আমি

তাকে সেই পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা”। (নিসা:১১৫)
তারা যদি বলে, তারা যা বুঝেছে সাহাবায়ে কেরামও তাই বুঝেছিলেন, তাহলে আমরা বলবো, তাদের জীবন ও কর্ম তো এ বুঝের পরিপন্থী। তাহলে কি তাদের বিষয়টি সত্য হওয়া সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম এর বিপরীত আমল করেছেন? অথচ যিন্দীক ছাড়া কেউ এমনটি বলতে পারে না। নিশ্চিয়ই তা ভ্রান্ত ও অবাস্তব। সুতরাং এটা সাহাবায়ে কেরামের বুঝ ও ইলম উভয়টিরই পরিপন্থী।
২। আল্লাহ তয়ালার বাণী-

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

(“আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তোমরাও সেই দিকে ঝুঁকে পড়বে”- আনফাল:৬১)
এই আয়াতটির তাফসীরের ব্যাপারে সালফে সালিহীনের মতামতগুলো জানতে হবে, যা সামনে ১০ নং পর্বে আসবে ইনশাআল্লাহ। (বইয়ের ১০ নং পর্ব)
৩। “তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাংখা করো না” এ হাদীসের ব্যাপারে কথা হল,
ইমাম বুখারী রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফ রা: থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সা. কোন এক যুদ্ধে শত্রুর প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে সূর্য্য পশ্চিম আকাশে হেলে যায়। তখন রাসূল সা. লোকদের মাঝে ভাষণ দেন। তিনি বলেন,

أيها الناس ، لا تمنوا لقاء العدو ، وسلوا الله العافية ،فإذا لقيتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ، ثم دعا فقال : اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.

"হে লোক সকল! তোমরা শত্রুর সাক্ষাতের আকাংখা করো না। আল্লাহর দরবারে মুক্ত থাকা কামনা কর। এরপর যখন শত্রুর মুখোমুখী হয়ে যাবে তখন একথা মনে রেখে যুদ্ধ করবে যে, 'তরবারীর ছায়াতলে জান্নাত'।

এরপর রাসুল সা. আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন-

'হে আল্লাহ! কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ সঞ্চালনকারী, বিশাল বাহিনীকে পরাজিতকারী, আপনি তাদের পরাজিত করুন, আমাদেরকে তাদের উপর সাহায্য করুন"।

এই হাদীসের বিবরণ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, রাসূল সা. কোন এক যুদ্ধে অবস্থানরত থাকা অবস্থায় একথা বলেছেন, যা হাদীসের শব্দগুলোতে স্পষ্ট।

হাদীসের শব্দগুলোর মাঝে আছে: ১. তিনি তাঁর কোন একটি যুদ্ধে ছিলেন। ২. যখন তোমরা তাদের মুখোমুখী হবে তখন অটল থাকবে। ৩. আপনি তাদেরকে পরাজিত করুন ও আমাদেরকে তাদের উপর সাহায্য করুন"।

সুতরাং এই হাদীসের মাধ্যমে আক্রমাণাত্মক জিহাদ না থাকার উপর কিভাবে দলীল দেওয়া যায়। অথচ রাসুল সা. হাদীসটি বলেছেনই জিহাদে থাকাবস্থায়।

তদুপরি হাদিসটিতে রয়েছে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই ও যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহ- 'জেনে রেখ! জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে'।

নি:সন্দেহে যুদ্ধে শত্রুর সাথে সরাসরি সংঘর্ষের সময়ই কেবল তরবারির ছায়াতলে থাকা যায়, যখন উভয়পক্ষ প্রতিপক্ষের উপর তরবারি দিয়ে চড়াও হয়। (ফাতহুল বারী ৬/৩৩)

সুতরাং রাসূল সা. এর যুদ্ধাবস্থায় এ হাদীসটি বলা এবং একই হাদীসে যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহ থাকাই প্রমাণ করে এই হাদীসটি সাধারণভাবে শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার কামনা করতে নিষেধ করেনি, বরং বিশেষ একটি কারণে নিষেধ করেছে, তা হচ্ছে, মুসলমানরা যেন আত্মগর্ব করা এবং নিজেদের শক্তির উপর নির্ভর করা থেকে বেঁচে থাকে ।

ইবনে হাজার রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় যা বলেছেন তা হল, এখানে শত্রুর সাক্ষাৎ কামনা করতে নিষেধ করার কারণ হল, এতে বাহ্যিকভাবে আত্মগর্ব,

সৈন্য ও শক্তির উপর ভরসা এবং শত্রুর ব্যাপারে গুরুত্বহীনতা দেখা যায়, যার সবকটিই সতর্কতা ও দৃঢ়তার পরিপন্থী।

কেউ কেউ বলেন, এই নিষেধাজ্ঞাটি প্রযোজ্য হবে যেখানে লাভ-ক্ষতির বিষয়টি সংশয়পূর্ণ হবে সেখানে। এ ছাড়া সাধারণভাবে যুদ্ধই মর্যাদাপূর্ণ ও সওয়াবের কাজ। (ফাতহুল বারী ২/৪৫) ইমাম নববী রহ.ও এমনই বলেছেন। (সহীহ মুসলিম বিশরহিন্ নববী১২/৪৫-৪৬)

শত্রুর সাথে সংঘর্ষ কামনা করার নিষেধাজ্ঞা যে সাধারণভাবে নয়,

তার আরেকটি দলীল হল, রাসূল সা.'র উপস্থিতিতে হযরত আনাস বিন নযর রা: এর যুদ্ধ কামনা করেন, অথচ রাসূল সা. তাকে কোন নিষেধ করেননি। ঘটনাটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম, রহ. হযরত আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণনা করেন।

আনাস বিন মালেক র: বর্ণনা করেন, আমার চাচা আনাস বিন নযর বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকেন, তাই তিনি রাসূল সা: কে বললেন, "আল্লাহর রাসূল! আমি মুশরিকদের সাথে সর্বপ্রথম যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত থেকেছি, আল্লাহ যদি আমাকে এরপর মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন, তাহলে আল্লাহ দেখবেন, আমি কি করি।

এরপর যখন উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হল এবং মুসলমানগণ সবাই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ল। তখন তিনি তার সাথীদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন,

اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء – يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء – يعني المشركين ثم تقدمواستقبله سعد بن

معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني لأجد ريحها من دون أحد فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع

“হে আল্লাহ ! এরা যা করেছে আমি তার ব্যাপারে তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং এই মুশরিকরা যা করে, তোমার নিকট তার থেকে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা করছি। এরপর তিনি সামনে বাড়লেন, সামনে সা’দ বিন মুয়ায রা. পড়ল। তিনি বললেন, হে সাদ ! নযরের প্রভুর শপথ! জান্নাত!!! আমি উহুদের পাদদেশ থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি!

সা’দ (র:) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি যা করলেন আমি তা পারলাম না”। বর্ণনাকারী সাহাবী আনাস বিন মালিক রা. বলেন, যুদ্ধের পরে আমরা দেখতে পেলাম, তার গায়ে আশিরটির অধিক তরবারি, বর্শা ও তীরের আঘাত লেগেছে। তিনি শহীদ হয়ে গেছেন। কাফেররা তার লাশ বিকৃত করে ফেলেছে। পরে তার বোন শুধু হাড়ের জোড়াগুলো দেখে তাকে চিনতে পেরেছিলেন।

হযরত আনাস বিন মালেক রা. বলেন, আমরা জেনে আসছি যে, আনাস বিন নযর ও তার অনুগামীদের ব্যাপারেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে-

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَه

“এই ঈমানদের মধ্যেই এমন লোকও আছে, যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছে এবং তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা তাদের নযরানা আদায় করেছে”। (আহযাব:২৩)

এখানে এই মহান সাহাবী শত্রুর সাথে সংঘর্ষ কামনা করেছেন এবং এক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে সততার পরিচয়ও দিয়েছেন। এর দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, শত্রুর সাক্ষাৎ কামনার ব্যাপারে নিষাধাজ্ঞা ছিল আত্মতৃপ্তি ও আত্মগৌরব যেন এসে না যায় সে জন্য, যা নিন্দনীয়।

সুতরাং বক্রদিলের অধিকারীরা আক্রমণাত্মক জিহাদের ব্যাপারে যে আপত্তিকে দলীল হিসাবে পেশ করে- এর দ্বারাই তার অসারতা প্রমাণিত হয়।

তারা এমন একটি বিষয়কে অস্বীকার করে, যেটাকে আল্লাহ তায়ালা দ্বীন বিজয়ের একমাত্র পন্থা হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

"(হে মুসলিমগণ!) তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যাবৎ না ফিতনা দূরীভুত হয় এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর হয়ে যায়"। (আনফাল:৩৯)
অন্য আয়াতে বলেন,

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

"যাতে তিনি অন্যসব দ্বীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করেন, তাতে মুশরিকগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক"। (তাওবা:৩৩, সফ্ফ:৯)
আল্লাহ্ তায়ালা অন্যত্র বলেন,

حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"যাবৎ না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া আদায় করে"। (তাওবা:২৯)
ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন,
জিহাদের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর বিধানটি সর্বোচ্চ হওয়া এবং একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। তিনি বলেন, এর কারণ হল, ক্ষমতা পূরিপূর্ণ আল্লাহর হওয়ার মানেই হল, কুফর ও তার অনুসারীদের লাঞ্চনা ও অপদস্থতা, তাদের মাথার উপর করের বাধ্যবাধকতা ও ঘাড়ে গোলামীর আবদ্ধতা। আর এটাই হল আল্লাহর কর্তৃত্ব ও দ্বীন।
এর সম্পূর্ণ বিপরীত হল, কাফেরদেরকে তাদের কামনা মত তাদের প্রতাপ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার উপর ছেড়ে দেওয়া, যার ফলে তাদের শৌর্য-বীর্য ও কর্তৃত্ব বহাল থাকে। (আহকামু আহলিয যিম্মাহ লি ইবনিল কায়্যিম, খ:১, পৃ:১৮)

উল্লেখ্য, পূর্বোক্ত কথা ও আল্লাহর বাণী- لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ("দ্বীনের বিষয়ে কোন জবরদস্তি নেই। হিদায়াতের পথ গোমরাহী থেকে পৃথকরূপে স্পষ্ট হয়ে গেছে"- বাকারা:২৫৬) এর মাঝে কোন বিরোধ নেই।

সুতরাং যুদ্ধ ওয়াজিব হওয়ার মূল লক্ষ্য হল আল্লাহর দ্বীন সর্বোচ্চ হওয়া, যা শত্রুর উপর মুসলমানদের বিজয় এবং বিজীত অঞ্চলসমূহে, বরং তার অধিবাসীদের উপরও ইসলামের বিধানাবলী সর্বোচ্চ কার্যকর হওয়া ব্যতীত হবে না।

এরপর যে ইসলাম গ্রহণ করবে সে স্বাচ্ছন্দে থাকবে ও ভাল থাকবে। আর যে কুফরের উপর অটল থাকবে তাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না, বরং তাকে তার কুফরের উপরই থাকতে দেওয়া হবে, তবে মুসলমানদের শাসনাধীন থাকতে হবে।

সুতরাং সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতে বাধ্য করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা হল ঈমান গ্রহণ করতে বাধ্য করা-لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ "দ্বীনের বিষয়ে কোন জবরদস্তি নেই।

আর সূরা তাওবার নিম্নোক্ত আয়াত যে বাধ্য করা প্রমাণ করে তা হল, তাদেরকে স্বধর্মে বহাল রেখে ইসলামী শাসনের অধীনতা মেনে নেয়ার জন্য বাধ্য করা- لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ "যাতে তিনি অন্যসব দ্বীনের উপর তাকে জয়যুক্ত করেন, তাতে মুশরিকগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক"।

শরীয়তে আহলে কিতাব ও তাদের স্বধর্মীদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা একটি স্বীকৃত বিধান। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে حَتَّىٰ يُعۡطُوا ٱلۡجِزۡيَةَ "যাবৎ না তারা জিযিয়া আদায় করে"। তবে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। তবে প্রতিমা পূজারীদের থেকে জিযিয়া গ্রহণের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে।

(দেখুন, তাফসীরে ইবনে কসীর, لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ আয়াতের অধীনে)

প্রতিটি মুসলমানের একথা জেনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, মুসলমানদের উপর আক্রমণাত্মক জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার উপর ঈমান রাখার মানেই হল সমসাময়ীক রাষ্ট্রগুলোর ঐ সমস্ত আইন কানুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা, যা এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্টের উপর আক্রমণ করাকে হারাম ঘোষণা করে রেখেছে।
এবং অন্য রাষ্ট্রের ভূমি শক্তি বলে দখল করে নেওয়াকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ক্ষমতাশালীরা নিজেদের প্রণীত এই সমস্ত আইনগুলোর মাধ্যমে স্বেচ্ছাচার করে থাকে,

কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ
“তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর”। (মায়িদা:৪৪)

অন্য আয়াতে বলেন, وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ “আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন, যারা তাঁর (দ্বীনের) সাহায্য করবে”। (হজ্ব:৪০)
পরিশেষে কথা হল, এই সমস্ত বিধানগুলো শক্তি ও সামর্থের উপর নির্ভরশীল। আর যখন এই সামর্থ না থাকবে তখন ওয়াজিব হবে এই শক্তি ও সামর্থ অর্জন করা, যাতে উপরোক্ত আবশ্যকীয় দায়িত্বগুলো আদায় করা যায়।
আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ“

“(হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত কর, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের (বর্তমান) শত্রুদেরকে সন্ত্রস্ত করে রাখবে এবং তাদের ছাড়া সেই সব লোককেও, যাদেরকে তোমরা এখনও জান না (কিন্তু) আল্লাহ জানেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা-কিছু ব্যয় করবে তা তোমাদের পরিপূর্ণরূপে দেওয়া হবে এবং তোমাদেরকে কিছু কম দেওয়া হবে না”। (আনফাল:৬০)